জনপ্রশাসন ও বেসরকারী প্রশাসন **(Public Administration and Private Administration) :** বেশ কিছু তাত্ত্বিক—যেমন, উরউইক (Urwick), ফেয়ল (Fayol), ফোলেট (Follett) মনে করেন যে প্রশাসনকে জনপ্রশাসন ও বেসরকারী প্রশাসন, এইভাবে দ্বিখণ্ডিত করা যায় না। প্রশাসন একটি অবিভাজ্য

একক এবং প্রশাসনের নীতিগুলোকে সমান সাফল্যের সঙ্গে জনপ্রশাসনে এবং বেসরকারী প্রশাসনে প্রয়োগ করা যায়।

জনপ্রশাসন বলতে মূলত সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়; অপরদিকে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনস্থ সংগঠনের প্রশাসনকে বেসরকারী প্রশাসন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই দুটি প্রশাসনিক ক্ষেত্র যে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র তা কখনোই নয়। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো দুই ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেই থাকে। যেমন হিসাব-রক্ষা, হিসাব-নিরীক্ষা, অফিস পরিচালনা, পরিসংখ্যান-রক্ষা ইত্যাদি কাজগুলো জনপ্রশাসন এবং বেসরকারী প্রশাসন উভয় ব্যবস্থাতেই থাকে।

এছাড়া আরও লক্ষণীয় হল শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রসারণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে জনপ্রশাসনের এতটাই বৃদ্ধি ঘটেছে যে জনপ্রশাসন এবং বেসরকারী প্রশাসনের বিভাজনরেখা ক্রমশই মুছে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে গ্রেট ব্রিটেনসহ বেশ কিছু ইউরোপীয় রাষ্ট্র কল্যাণবাদী অর্থনীতি গ্রহণ করে। এই অর্থনীতির মূলে রয়েছে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা যা রাষ্ট্রেই গ্রহণ করবে ও রূপায়ণ করবে। পরবর্তীকালে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এই মতবাদ গ্রহণ করে। ফলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্মমুখিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং জনপ্রশাসনের কাজের চাপ অনেক বাড়ে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন ও বেসরকারী প্রশাসনকে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে কাজ করতে হয়।

১৯৭০ এর দশক থেকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোয় কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সেই সময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় সংস্থার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসনের বিভিন্ন দিক সমালোচিত হতে থাকে। আমলাতন্ত্রের অতিরিক্ত বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অনেকেই সরব হন। 'জন পছন্দ' (Public Choice) গোষ্ঠী আমলাতন্ত্রের সীমিতকরণের কথা বলতে থাকে। সাধারণভাবে, জনপ্রশাসনের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রতা, আমলাতান্ত্রিকতা, লাল ফিতের ফাঁস ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৯ সালে গ্রেট ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এবং ১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোনাল্ড রেগন রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে সঙ্কুচিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না; স্পেন, ইতালি, জার্মানী, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলোতেও বেসরকারী ক্ষেত্র বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিধি, রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং জনপ্রশাসনের সংকোচনের ক্ষেত্রে বহুবিধ কারণ থাকলেও সরকারী ক্ষেত্রের অদক্ষতা ও দীর্ঘসূত্রতাকে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হয়েছিল। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আমলাতন্ত্র প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারী কাজকর্ম বহুক্ষেত্রেই সমালোচিত হচ্ছিল এবং বেসরকারী সংস্থার কাজকর্ম তথা বেসরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অনেক বেশী দক্ষ, কার্যকরী ও ফলপ্রসূ ভাবা হয়েছিল।

জনপ্রশাসনের দুর্বলতা এবং বেসরকারী প্রশাসনের যে সাফল্যের কথা ১৯৮০র দশক থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বলা হচ্ছিল তার থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট—তা হল জনপ্রশাসন এবং বেসরকারী প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং দুটিকে কিছুটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত।

প্রথমত, বেসরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে লাভ বা মুনাফা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। বেশ কিছু বেসরকারী সংস্থা আছে যেগুলো জনগণকে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা দিয়ে থাকে। কিন্তু সেই সংস্থাগুলো যদি সম্পূর্ণভাবে অলাভজনক হয় তাহলে সেই সংস্থাগুলোকে টিকিয়ে রাখা হয় না। অপরদিকে সরকারী সংস্থা লাভ বা মুনাফার মুখ চেয়ে কাজ করে না। মূলত, এই সংস্থাগুলো পরিষেবামূলক। ফলে প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয়ত যেহেতু এই দু'ধরনের সংস্থার মধ্যে প্রকৃতি, অভীষ্ট লক্ষ্য এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য অনেক, ফলে কাজের প্রকৃতিও দু'ধরনের সংস্থার ক্ষেত্রে ভিন্ন। বেসরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে দক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দ্রুত কাজের নিষ্পত্তি ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়; অপরদিকে জনপ্রশাসনে নিয়ম-বিধির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার জন্ম দেয়।

তৃতীয়ত, বাস্তব প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসনের পরিধি অপরিসীম। সরকারের কিছু কিছু কাজ এমন ধরনের যে বেসরকারী প্রসাশনের সঙ্গে তা কখনোই তুলনীয় নয়। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কাঠামোর সাহায্য নিতে হয় যেমন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী, যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেল-ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই ব্যবস্থাগুলোর প্রশাসনিক কাজের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে বেসরকারী প্রশাসন কখনোই তুলনীয় নয়।

চতুর্থত, উন্নয়নশীল, জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনের পরিধি আরও বিস্তৃত। এইসব রাষ্ট্রে জনগণের সামাজিক দায়িত্বগুলোও রাষ্ট্রের ওপর থাকে বলে ডাক-ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও বীমা পরিষেবা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা—এগুলোও জনপ্রশাসনের আওতার মধ্যে পড়ে। এমনকি শিল্পের পরিকাঠামো নির্মাণ তার উন্নয়ন, বিপণন ইত্যাদিও রাষ্ট্রই করে থাকে। ফলে এইসব রাষ্ট্রে বেসরকারী প্রশাসনের সুযোগ ও পরিধি অনেক কম।

পঞ্চমত এবং সবশেষে বলা যায় যে জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নিয়মনির্ভরতার কথা আগে বলা হলেও বলা প্রয়োজন যে নিয়মকানুন জনপ্রশাসনের একটা অঙ্গ। কোনো অবস্থাতেই নিয়মকানুনের বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ জনপ্রশাসনের পক্ষে সম্ভব নয়; বস্তুত তা করা হলে সেই সিদ্ধান্তটিকে বেআইনি বলা হবে। এই ধরনের বাধ্যবাধকতা বেসরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে থাকে না। বেসরকারী প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে সাফল্য-কেন্দ্রিক এবং সাফল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংস্থার মুনাফাই প্রধান নির্ণায়ক।

এই পার্থক্যগুলো থাকলেও জনপ্রশাসন এবং বেসরকারী প্রশাসনকে দু'ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। বরং এই দুটিকে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার দুটি দিক হিসেবে দেখা উচিত। যেহেতু এই দুই ব্যবস্থার লক্ষ্য এবং দায় ভিন্ন সেই কারণেই এই দুই ব্যবস্থার প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।